بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ২৯ মে, ২০২৬ মোতাবেক ২৯ হিজরত, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজ মনিব ও অনুসরণীয় নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর শিক্ষা এবং সুন্নত অনুযায়ী তাঁর (সা.) নিষ্ঠাবান দাসের বিনয় ও নম্রতার ঘটনাবলি এবং নিজের জামা'তকে এমন বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করার উপদেশ দেবার বিষয়ে আজ আমি কিছু বলব।

তাঁর (আ.) বিনয়ের উন্নত মান দেখে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ইলহামের মাধ্যমে এর স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। ১৯০৭ সালের ১৮ই মার্চ তাঁর প্রতি ইলহাম হয়– *تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں* **'তোমার বিনয়াবনত পন্থা তাঁর পছন্দ হয়েছে।'** হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন:

"এই অধমের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই অধম নিজের দীনতা, নম্রতা, খোদানির্ভরতা, আত্মত্যাগ, নিদর্শনাবলি এবং জ্যোর্তিমালার নিরিখে (ঈসা) মসীহ্র প্রথম জীবনের এক নমুনা বা দৃষ্টান্ত। এই অধমের প্রকৃতি ও মসীহ্র প্রকৃতি পরস্পরের সাথে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ, যেন তা একই রত্নের দুটি টুকরো অথবা একই বৃক্ষের দুটি ফল। ঐকতানের সীমাপরিসীমার দিক থেকে আত্মিক দৃষ্টির নিরিখে পার্থক্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলে প্রতিভাত হয়; বাহ্যিকভাবেও একটি সামঞ্জস্য বিদ্যমান। আর তা হলো, মসীহ্ এক কামিল ও মহান নবী অর্থাৎ মূসার অনুসারী ও ধর্মের সেবক ছিলেন এবং তাঁর ইঞ্জিল, তওরাতের একটি শাখা ছিল। এই অধমও সেই মহামহিম নবীর (সা.) তুচ্ছ সেবকদের একজন, যিনি রসূলদের নেতা এবং সকল রসূলের মাথার মুকুট।"

একদা এক ব্যক্তি হযরত আকদাস (আ.)-এর সমীপে নিবেদন করে, হুযূর 'হকীকাতুল ওহী' লেখার ক্ষেত্রে, *যা তাঁর জীবনের শেষভাগে লিখিত গ্রন্থ*, এবং প্রুফগুলো বারবার পড়তে অনেক পরিশ্রম করেছেন এবং এই কারণেই হুযূর বারবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। এখন হুযূর কয়েক দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম করুন এবং লেখাপড়ার কাজ পুরোপুরি পরিত্যাগ করুন। হযরত সাহেব উত্তরে বলেন, **'আমাদের পরিশ্রম আর কী জিনিস! সাহাবীদের (রা.) পরিশ্রমের দিকে তাকালে আমাদের লজ্জাই পেতে হয় যে, কীভাবে তারা সানন্দে আল্লাহ্র পথে নিজেদের মাথা পেতে দিয়েছেন বা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।'**

এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, "স্বল্প বুদ্ধির লোকেরা আপত্তি করে বলে, আমি নাকি আমার মর্যাদা সীমাতিরিক্ত বর্ণনা করি। *অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করছেন। তিনি (আ.) বলেন*, আমি আল্লাহ্ তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমার স্বভাব এবং প্রকৃতিতেই এ বিষয়টি নেই যে, আমি নিজেকে কোনো প্রশংসার আকাঙ্ক্ষী মনে করব এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশে খুশি হবো। আমি সর্বদা নম্রতা ও অজ্ঞাত জীবনযাপন পছন্দ করেছি। কিন্তু এটি আমার শক্তি ও সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে ছিল, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আমাকে বাইরে এনেছেন এবং আমার প্রতি অবতীর্ণ তাঁর বাণীতে তিনি আমার প্রশংসা ও

শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করেছেন। এসব প্রশংসা এবং সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা.)-এরই।"

নবাগত মুসলমানদেরও তিনি ইসলামের বিনয় ও সরলতার শিক্ষার বিষয়ে উপদেশ দিতেন। যেমন লেখা আছে, ১৯০৩ সালের ২২শে অক্টোবর হযরত আকদাস (আ.)-এর সমীপে মুহাম্মদ আব্দুল হক নামে অস্ট্রেলিয়ার একজন নও-মুসলিম আসেন। আলোচনাকালে হযরত আকদাস (আ.) তাকে বলেন, "আমাদের নীতিমালার মধ্যে একটি হলো, আমরা এক অনাড়ম্বর জীবনযাপন করি। আজকাল ইউরোপ যে-সব কৃত্রিমতাকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে রেখেছে, তা থেকে আমাদের বৈঠক পবিত্র। আমরা প্রথা ও অভ্যাসের দাস নই। আমরা কেবল সেই সীমা পর্যন্ত প্রতিটি অভ্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখি, যা বর্জন করলে কোনো কষ্ট বা পাপের আশঙ্কা থাকে। এছাড়া পানাহার এবং ওঠা-বসার ক্ষেত্রে আমরা অনাড়ম্বর ও সরল জীবনকেই পছন্দ করি।"

এগুলো হলো বিনয়ের সেই উন্নত মান, যা তিনি তাঁর জামা'তের সদস্যদের মাঝেও সৃষ্টি করতে চাইতেন। বস্তুত এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, "বিনয় অবলম্বন করা উচিত। বিনয় শেখা কোনো কঠিন কাজ নয়; আর শেখারই বা কী আছে, মানুষ তো নিজেই দুর্বল ও অক্ষম। আর সে তো বিনয়ের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা আয-যারিয়াত:৫৭)

'আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।' অহংকার ইত্যাদি সবকিছুই কৃত্রিম। সে যদি এই কৃত্রিমতাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাহলে তার প্রকৃতিতে বিনয়ই দৃষ্টিগোচর হবে।"

কাজেই, এটি হলো সেই মূলনীতি, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যও লাভ করা যায়। বিনয় অবলম্বনের উপদেশ দিতে গিয়ে এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন,

"আশিসমণ্ডিত তারা– যারা নিজেদেরকে সবার চেয়ে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র মনে করে এবং লাজুকতার সাথে কথা বলে এবং দরিদ্র ও মিসকীনদের সম্মান করে এবং দুর্বলদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করে এবং দুষ্কৃতি ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে কখনো ঠাট্টাবিদ্রুপ করে না এবং নিজেদের প্রভু-প্রতিপালককে স্মরণ রাখে আর পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে। অতএব, আমি বার বার বলছি, এরাই সেসব মানুষ যাদের জন্য নাজাত বা পরিত্রাণ প্রস্তুত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি দুষ্কৃতি ও অহংকার, স্বার্থপরতা, দম্ভ, জগৎপূজা, লোভ এবং অপকর্মের জাহান্নাম থেকে এই জগতেই মুক্তি লাভ করে নি, সে পরকালেও তা থেকে কখনো মুক্তি লাভ করতে পারবে না। *অর্থাৎ, এই জগতে যে-সব সৎকর্ম করা হবে, সেগুলোই পরকালেও কাজে আসবে। তিনি (আ.) বলেন,* আমি কী করব এবং কোথা থেকে এমন শব্দাবলি নিয়ে আসব যা এই দলের সদস্যদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করবে? *অর্থাৎ আমার মান্যকারীদের ওপর। হে* খোদা! আমাকে এমন শব্দাবলি শেখাও এবং এমন বক্তব্য ইলহাম করো, যা এসব হৃদয়ের ওপর স্বীয় জ্যোতি বর্ষণ করবে এবং স্বীয় প্রতিষেধক গুণের মাধ্যমে তাদের বিষ দূর করে দেবে। আমার প্রাণ এই আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে আছে যে, কখনো কি এমন দিন আসবে, যে-দিন আমি আমার জামা'তের মাঝে অধিক হারে এমন লোকদের দেখব, যারা সত্যিকার অর্থেই মিথ্যা বর্জন করেছে এবং নিজেদের খোদার সাথে এক সত্য অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে যে, তারা প্রত্যেক মন্দ থেকে নিজেদের দূরে রাখবে এবং অহংকার

থেকে– যা সকল অনিষ্টের মূল– তা থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরে যাবে এবং নিজেদের প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করতে থাকবে।"

কোনো কোনো মানুষের জলসা কিংবা কোনো অনুষ্ঠান হলে, বিশেষভাবে সামনের চেয়ারে বসার আকাঙ্ক্ষা থাকে। জলসা ইত্যাদিতে সাধারণত গ্রিন এরিয়া বা এমন এলাকা থাকে, যেখানে বিশেষভাবে সামনে বসার জন্য বিশেষ আকাঙ্ক্ষা থাকে। যুগ-খলীফার কাছাকাছি বসে তাঁর কথা শোনার জন্য হলে বিষয়টি ঠিক আছে, কিন্তু অনেক সময় এর সাথে অহমিকাও যুক্ত হয়ে যায়। এটি হওয়া উচিত নয়। কেননা এর ফলে আয়োজকদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। যাহোক, এমন আকাঙ্ক্ষা পোষণকারীদের প্রতি উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"মানুষের উচিত, সে কোথাও গেলে নিজের জন্য সবচেয়ে নীচু স্থানটি বেছে নেওয়া। আর সে যদি অন্য কোনো স্থানের যোগ্য হয়, তবে আয়োজকরা স্বয়ং তাকে ডেকে জায়গা দেবেন এবং তাকে সম্মান করবেন।" *যদি সামনে বসাতে হয়, তাহলে ঠিক আছে, একটি নেযাম বা ব্যবস্থাপনা রয়েছে; তারা বলে, 'আবেদন করুন, আমরা দেখব'। ব্যবস্থাপনা যদি আবেদনের বিষয়টি বিবেচনা না করে কিংবা কোনো অপারগতার কারণে (আবেদন) নামঞ্জুর করে থাকে, তাহলে কোনো প্রকার আপত্তি না করে, মনে কোনো অভিযোগ সৃষ্টি না করে তাদের কথা মেনে নেওয়া উচিত।*

আবার ঐশী ভালোবাসা লাভের জন্যও বিনয় আবশ্যক। এ বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"কোনো ব্যক্তি খোদা তা'লার প্রতি ভালোবাসা এবং ঐশী সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না, যতক্ষণ না তার মাঝে দুটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। প্রথমত, অহংকার চূর্ণ করা, যেভাবে একটি দণ্ডায়মান পাহাড় যা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে– তা ধসে পড়ে মাটির সাথে মিশে যায়; অনুরূপভাবে মানুষেরও উচিত যাবতীয় অহংকার এবং অহমিকাপূর্ণ চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করা; দীনতা, নম্রতা এবং বিনয় অবলম্বন করা। আর দ্বিতীয়টি হলো, তার পূর্বের যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়া; যেমনটি পাহাড় ধসে পড়ে 'মুতাসাদ্দিআন' (مُتَصَدِّعًا) হয়ে যায়। *পবিত্র কুরআনে যেভাবে 'মুতাসাদ্দিআন' শব্দ এসেছে,* অর্থাৎ টুকরো টুকরো হয়ে যায়, এক ইট থেকে আরেক ইট আলাদা হয়ে যায়; ঠিক তেমনি তার পূর্বের যে-সব সম্পর্ক নোংরামি ও খোদার অসন্তুষ্টির কারণ ছিল, সে সমস্ত সম্পর্ক যেন ছিন্ন হয়ে যায়।"

এর অর্থ হলো, যে-সব পুরনো সম্পর্ক থেকে তোমাদের মাঝে মন্দের জন্ম হচ্ছিল, সেসব মন্দ সম্পর্ককে ছিন্ন করা। এর অর্থ এটি নয় যে, সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্কই ছিন্ন করতে হবে, যেন এরপর পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। আর এখন তার সমস্ত সাক্ষাৎ, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা এবং শত্রুতা কেবল আল্লাহ্ তা'লার জন্যই নিবেদিত থাকে। সে যে কাজই করুকতা যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই হয়। এক স্থানে তিনি বলেন:

আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্যতার পাপ থেকে বাঁচার জন্য إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (সূরা আল-ফাতিহা:৫) আয়াতটি রয়েছে; অর্থাৎ, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। যে-সব লোক নিজেদের প্রভুর সম্মুখে নম্রতার সাথে দোয়ায় রত থাকে যেন তাদের কোনো বিনয় গৃহীত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাদের সাহায্যকারী হয়ে যান।

এ প্রসঙ্গে তিনি একটি গল্প বর্ণনা করেন; এক ইবাদতকারী ব্যক্তি অনেক দোয়া করত যে, হে আল্লাহ্! আমাকে পাপ থেকে মুক্তি দাও। সে অনেক দোয়া করার পর ভাবল, সবচেয়ে বেশি বিনয় কীভাবে প্রকাশ করা যায়, কীভাবে বিনয়ী হওয়া সম্ভব, বিনয় প্রকাশের উপায় কী? তখন চিন্তাভাবনা করে তার মনে হলো, কুকুরের চেয়ে বেশি দীন ও নীচ আর কিছু নেই। তাই সে কুকুরের মতো আওয়াজ করে কাঁদতে শুরু করল। অন্য এক ব্যক্তি মনে করল যে, মসজিদে কুকুর ঢুকে পড়েছে। (সে ভাবে,) কোথাও আমার পাত্র না নোংরা করে ফেলে। তখন সে এসে দেখল, সেখানে সেই ইবাদতকারী ব্যক্তিই উপস্থিত, সেখানে কোনো কুকুর নেই। অবশেষে সে জিজ্ঞেস করল, এখানে কুকুর কাঁদছিল, আমি আওয়াজ পেয়েছি; কোথায়? তখন সেই ইবাদতকারী বলল, আমিই সেই কুকুর। সেই ব্যক্তি এরপর জিজ্ঞেস করল, তুমি এভাবে কাঁদছিলে কেন? সে বলল, খোদা তা'লা বিনয় পছন্দ করেন; তাই আমি ভাবলাম, এভাবে হয়ত আমার বিনয় গৃহীত হয়ে যাবে। যা-ই হোক, এটি ছিল তার চিন্তাধারা এবং সেই অনুযায়ী সে আমল করেছে। উদ্দেশ্য ছিল– সবচেয়ে ক্ষুদ্র ও নগণ্য হয়ে হলেও যেন কোনোভাবে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করতে পারি। এই প্রসঙ্গে তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন:

মানুষ– যে কিনা এক দুর্বল ও অক্ষম সৃষ্টি– সে নিজের কর্মদোষের কারণে নিজেকে বড়ো মনে করতে শুরু করে। এটি তার কর্মদোষই বটে, যার ফলে বড়োত্বের অহমিকা সৃষ্টি হয়, অহংকার ও দম্ভ তার মাঝে এসে যায়। আল্লাহ্‌র পথে যতক্ষণ না মানুষ নিজেকে সবার চেয়ে ক্ষুদ্র মনে করবে, ততক্ষণ সে মুক্তি পেতে পারে না।

তাঁর (আ.) হাতে বয়আতকারীদের বিনয়ের সর্বোচ্চ মান অর্জনের উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন:

এই যে বয়আত, এর প্রকৃত অর্থ হলো নিজেকে বিক্রি করে দেওয়া। এর কল্যাণ ও প্রভাব এই শর্তের সাথেই সম্পৃক্ত। যেমন, একটি বীজ যখন মাটিতে বপন করা হয়, তখন এর প্রাথমিক অবস্থা এটিই হয়ে থাকে যে, কৃষকের হাতে বপিত হয়েছে এবং এর কোনো খবর থাকে না– এখন এটি কোথায়, কী অবস্থায় থাকবে। মাটিতে ফেলে দেওয়া হলো, মাটির ভেতর হারিয়ে গিয়েছে; এখন আর জানা নেই এর কী পরিণতি হবে। কিন্তু যদি সেই বীজটি উন্নত মানের হয় এবং এর মাঝে বেড়ে ওঠার শক্তি বিদ্যমান থাকে, তবে খোদার কৃপায় এবং সেই কৃষকের চেষ্টায় তা ওপরে উঠে আসে। তা অঙ্কুরিত হয়, এর কুঁড়ি বেরিয়ে আসে। আর (সেটি) এক দানা থেকে হাজার দানায় পরিণত হয়। অনুরূপভাবে, বয়আতকারী ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করতে হয় এবং নিজের আমিত্ব ও প্রবৃত্তি থেকে পৃথক হতে হয়। তখনই সে বিকাশের যোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু যে ব্যক্তি বয়আতের পর নিজ অবাধ্য প্রবৃত্তিকেও লালন করে, সে কখনোই কল্যাণ লাভ করতে পারে না। বিনয় ছাড়া তো বয়আতেরও কোনো লাভ নেই। তিনি বলেন, তোমরা যতটা কোমলতা অবলম্বন করবে এবং যতটা নম্রতা ও বিনয় প্রদর্শন করবে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি ঠিক ততটাই সন্তুষ্ট হবেন। যে ব্যক্তি বিনয়ের সাথে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি কামনা করে, খোদা তা'লা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

অতঃপর বিনয় প্রসঙ্গে অথবা বিনয় প্রদর্শন করলে কী লাভ হয় এবং অহংকার মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়– এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন:

প্রথমে আদমও পাপ করেছিলেন এবং শয়তানও পাপ করেছিল; কিন্তু আদমের মাঝে অহংকার ছিল না, তাই তিনি খোদা তা'লার সমীপে নিজ পাপ স্বীকার করেন এবং তাঁর পাপ

ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এটি হতে বুঝা যায়, মানুষের জন্য তওবার কল্যাণে পাপ ক্ষমার আশা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আদমের পাপ ক্ষমা করেছেন। তাই মানুষও যদি বিনয় প্রদর্শন করে, তওবা করে, তবে তার আশা রাখা উচিত– আল্লাহ্ তা'লা তাকেও ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু শয়তান অহংকার করেছিল এবং সে অভিশপ্ত হয়েছে, তার ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ নিপতিত হয়। আর যে বিষয়টি মানুষের মাঝে নেই, (অর্থাৎ অহংকার; শয়তানের মাঝে যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে তা মানুষের মাঝে নেই, মানুষ তো বিনয়ী হতে পারে;) অহংকারী ব্যক্তি অযথা নিজের জন্য সেই জিনিসের দাবি করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। অহংকার মানুষের প্রকৃতিতেই নেই, তা সত্ত্বেও সে শয়তানের মতো অযথাই বড়ো হবার দাবি করতে শুরু করে। তিনি আরও বলেন, নবীদের মাঝে অনেক গুণ থাকে, সেগুলোর মধ্যে একটি গুণ হলো আমিত্ব বর্জন। অর্থাৎ, নিজের আমিত্বকে পিষ্ট করা। তাদের মাঝে কোনো অহংবোধ অবশিষ্ট থাকে না। তাঁরা নিজেদের প্রবৃত্তির ওপর এক মৃত্যু আনয়ন করেন। গর্ব কেবল খোদারই জন্যই নির্ধারিত। যারা অহংকার করে না এবং বিনয় অবলম্বন করে– তারা কখনো ধ্বংস হয় না।

অতঃপর বিনয় অবলম্বনের উপদেশ দিতে গিয়ে এক স্থানে তিনি (আ.) বলেছেন:

এখনো জামা'তে এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যারা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামান্য কোনো কথা শুনলেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। অথচ এ ধরনের সকল উত্তেজনা দমন করা অত্যন্ত জরুরি, যেন স্বভাবে সহনশীলতা ও নমনীয়তা সৃষ্টি হয়। দেখা যায়, একটি সামান্য বিষয় নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে একে অপরকে পরাস্ত করার চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে। একে অপরকে পরাস্ত করার চিন্তায় থাকে যে, কীভাবে আমি বিজয়ী হবো। এমন মুহূর্তে প্রবৃত্তির উত্তেজনা এড়ানোর চেষ্টা থাকা উচিত এবং বিবাদ মেটানোর স্বার্থে ছোটোখাটো বিষয়ে সজ্ঞানে নিজেই নিজের অবমাননা বা পরাজয় মেনে নেওয়া উচিত। প্রতিযোগিতায় নিজের অন্য ভাইকে অপদস্থ করার চেষ্টা কখনোই করা উচিত নয়। আমরা যদি আমাদের জীবনে এর পর্যালোচনা করি, তবে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা এই মিথ্যা আত্মমর্যাদাবোধ রাখে এবং তাদের মাঝে অহংকার বা আমিত্ব বিদ্যমান, যে কারণে ঝগড়াবিবাদও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা থাকে, তবে এ থেকে মুক্তি লাভ হয়। এমনকি কেউ কেউ তো অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। কখনো কখনো অন্যায়ভাবে এই অভিযোগ দায়ের করে বসে যে, অমুক জায়গায় আমাদের ঝগড়া হয়েছিল, অমুক জায়গায় সে আমাকে বাজে কথা বলেছিল, তাই এখন আমি তাকে অন্যায়ভাবে হলেও মিথ্যা মামলা বা কোনো শাস্তির মুখোমুখি করব।

এক স্থানে বিনয় অবলম্বনকারীদের মৃত্যুর পরের দৃষ্টান্ত প্রদান করে তিনি (আ.) বলেন, মৃত্যু তো সবার জন্য অবধারিত। একদিন এই পৃথিবী থেকে যেতেই হবে। পরিশেষে এক না একদিন সবার সাথেই এই অবস্থা হতে যাচ্ছে। তবে দীনতার সাথে, নিরীহ হয়ে, অসহায়ের ন্যায় এবং বিনয়ের সাথে যে মানুষ মৃত্যুবরণ করে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য যেন বেহেশত অগ্রসর হয়ে আসে। যেমন, হযরত ঈসা (আ.) লাযের সম্পর্কে বলেছিলেন। লাযের কে ছিল– যার উল্লেখ করা হয়েছে? এই ঘটনা ইঞ্জিলের লুক অধ্যায়ে লেখা আছে। এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। সে লাল রঙের মিহি কাপড় পরিধান করত। রঙ-বেরঙের নরম মসৃণ কাপড় পরিধান করত। সে প্রতিদিন আনন্দ উদযাপন করত আর জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করত। ইঞ্জিলে এই ঘটনা লিখিত আছে। আর লাযের নামক এক দরিদ্র ব্যক্তি ছিল, যার সর্বাঙ্গ দুরারোগ্য ক্ষতে ভরা ছিল। ফোড়া-পাঁচড়া বের হয়েছিল, চর্মরোগ ছিল। তাকে তার

(অর্থাৎ ধনাঢ্য ব্যক্তির) দরজায় এনে রাখা হয়। সে সেই ধনী ব্যক্তির দরজায় বসে থাকত। সে এই আশায় থাকত যে, ধনী ব্যক্তির খাবারের টেবিলের উচ্ছিষ্ট টুকরা দ্বারা নিজের ক্ষুধা মেটাবে, অর্থাৎ সেখান থেকে বেঁচে যাওয়া খাবার বাইরে নিক্ষেপ করলে আমিও খাব। এমনকি কুকুরও এসে তার ক্ষত চাটত! এতো দুর্বল ও করুণ দশা ছিল যে, কুকুরকেও তাড়াতে পারত না আর কুকুরও এসে তার ক্ষত চাটত। বাইবেলে লেখা আছে, পরিশেষে এমন হয়েছে যে, সেই দরিদ্র ব্যক্তিটি মারা যায় আর ফেরেশতারা তাকে নিয়ে গিয়ে ইবরাহীম (আ.)-এর কোলে রেখে দেয়। আর ধনী ব্যক্তিটিও মারা যায় আর তাকে দাফন করা হয়। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, সে আত্মিক জগতে আযাবে নিপতিত হয়ে নিজের চোখ তুলে তাকায় আর ইবরাহীম (আ.)-কে দূর থেকে দেখে এবং তাঁর কোলে লাযেরকে দেখতে পায়। সে চিৎকার করে বলে, হে পিতা ইবরাহীম! আমার প্রতি কৃপা করে লাযেরকে প্রেরণ করুন যেন সে নিজের আঙ্গুলের ডগা পানিতে ভিজিয়ে আমার জিহ্বাকে সিক্ত করে। লাযেরকে পাঠিয়ে দিন যেন আমাকে এই শাস্তি থেকে বাঁচায় আর নিজের আঙ্গুল ভিজিয়ে অন্তত পানি আমার জিহ্বায় দেয়। কেননা আমি এই আগুনে ছটফট করছি। ইবরাহীম (আ.) বলেন, বৎস! স্মরণ করো! তুমি ইহলোকে বিলাসিতা করেছ আর লাযের মন্দ জিনিস দেখেছে। সে তো দুনিয়াতে কিছুই পায় নি। কিন্তু এখন সে এখানে আরাম-আয়েশ লাভ করছে আর তুমি ছটফট করছ।

মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অতএব পরিশেষে অহংকার প্রদর্শনকারীদের এই পরিণতিই হয়। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত একজন গরীব, অসহায় বৃদ্ধার সাথে সেই আচরণ না করবে যা একজন উচ্চবংশীয় মর্যাদাবান ব্যক্তির সাথে করে থাকে বা করা উচিত, এবং সকল প্রকার অহংকার, গর্ব, আত্মম্ভরিতা থেকে নিজেকে রক্ষা না করবে– সে কখনো ঐশী রাজত্বে স্থান পাবে না।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, অহংকারী খোদার আসনে বসতে চায়। সুতরাং এই নোংরা অভ্যাস থেকে মুক্ত থাকার জন্য সর্বদা খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করো। খোদা তা'লার সব প্রতিশ্রুতিও যদি তোমাদের সাথে থাকে তাহলেও তোমরা বিনয় অবলম্বন করো, কেননা বিনয় অবলম্বনকারীই খোদা তা'লার প্রিয় হয়ে থাকে।

অতঃপর বিনয় ও দীনতা সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করে তিনি (আ.) বলেন, বিনয় ও দীনতা উৎকৃষ্ট জিনিস। যে ব্যক্তি অভাবী হওয়া সত্ত্বেও অহংকার করে সে কখনো লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। তার উচিত বিনয় অবলম্বন করা। বলা হয়ে থাকে, জালীনুস হাকীম এক বাদশার চাকরি করত। এটি আরেকটি ঘটনা। বাদশার এমন অভ্যাস ছিল যে, তিনি স্বাস্থ্যহানীকর খাবার গ্রহণ করতেন। এতে জালীনুসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বাদশা অবশ্যই কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হবে। ক্ষতিকর খাবার ছিল। বর্তমানেও বলা হয়ে থাকে, 'জাঙ্ক ফুড বর্জন করো'। হয়ত সেই যুগেও এ ধরনের ব্যাপার ছিল। যাহোক, জালীনুসের বিশ্বাস ছিল, এই জিনিসগুলো তাকে অসুস্থ করে তুলবে, এমনকি কুষ্ঠ রোগের কারণও হতে পারে। একারণে তিনি বাদশাকে বিরত রাখতে চাইতেন, কিন্তু বাদশা বিরত হতেন না। এতে অতিষ্ঠ হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে জালীনুস নিজ জন্মভূমিতে ফিরে যায়। *সে বাদশার রাজদরবার পরিত্যাগ করে নিজ জন্মভূমিতে ফিরে যায়।* কিছুদিন পর বাদশার শরীরে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ দেখা দেয়। *পরিশেষে তা-ই হলো যা জালীনুস বলেছিল। কুষ্ঠরোগ হওয়া শুরু হলো।* তখন বাদশা নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং তিনি বিনয় অবলম্বন করেন। নিজের পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে ফকিরের বেশে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং জালীনুসের কাছে পৌছান। জালীনুস তাকে চিনতে পারেন এবং বাদশার বিনয় তার পছন্দ হয়। *অর্থাৎ, বিনম্রতা*

তার পছন্দ হয় এই ভেবে যে, তিনি বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছেন, আমার কাছে চলে এসেছেন। আর তিনি তার চিকিৎসায় পরিপূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করেন, ফলে খোদা তা'লা তাকে আরোগ্য দান করেন।

নিজের একটি বৈঠকে তাঁর ইলহামের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) যে উপদেশ প্রদান করেছেন তার উল্লেখ রেওয়ায়েতে এভাবে এসেছে যে, হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) ফজরের সময় এসে নামাযের পূর্বে কিছুক্ষণ সময় বৈঠক করেন। অর্থাৎ, [তিনি (আ.)] ফজরের নামাযের পূর্বে আসেন এবং বৈঠক করেন আর **إني أحافظ كل من في الدار الا الذين علوا واستكبروا** অর্থাৎ 'আমি তোমার ঘরের চতুঃসীমার মাঝে বসবাসকারীদের নিরাপত্তা প্রদান করব, কেবল সে-সকল লোক ব্যতীত যারা দম্ভ ও অহংকার করেছে'–এই ইলহাম সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, এক্ষেত্রে ঔদ্ধত্য ও অহংকার বলতে ধনসম্পদ ও পদমর্যাদার অহংকার বোঝায় না, বরং প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র সামনে নিজেকে বিনয়ী ও বিনম্রভাবে উপস্থাপন করে না এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করে না, তারা দরিদ্র হলেও এর অর্ন্তভুক্ত। *বিনয়াবলম্বনকারীই (এই) গৃহে প্রবেশকারী হবে।*

অতঃপর তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, মানুষ যখন সফলতা লাভ করে এবং কষ্ট ও দুর্দশাগ্রস্ত হয় না, সেই সময়ে যে ব্যক্তি বিনয়াবলম্বন করে এবং খোদাকে স্মরণ রাখে– সে-ই কামিল। তিনি (আ.) এই বিষয়গুলো জামা'তকে কেবল উপদেশ প্রদান করেই ক্ষান্ত হন নি বরং নিজ কর্মের মাধ্যমে এই বিষয়গুলো ফুটিয়ে তুলেছেন, প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। শুরুতে আমি যেটির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (বিনয়ী) কর্ম পছন্দ করেছেন। যাহোক, কতিপয় রেওয়ায়েত তাঁর নিজের আচারআচরণ সংক্রান্ত।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন, আমাকে মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব বলেছেন, দাদাজান আমাদের জেঠা মির্যা গোলাম কাদের সাহেবকে বৈঠকে বসার জন্য চেয়ার প্রদান করতেন। হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব বলছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বড়ো ভাইকে বৈঠকে বসার জন্য চেয়ার দেওয়া হতো, অর্থাৎ তিনি যখন দাদাজানের কাছে যেতেন তখন তাকে (দাদাজান) চেয়ারে বসাতেন। কিন্তু আব্বাজান গিয়ে নীচে জনসাধারণের সারিতে বসে পড়তেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখনই এমন বৈঠকে যেতেন, পেছনে সাধারণ মানুষের সারিতে বসতেন, সেখানে বসে পড়তেন। (বৈঠকে) কখনো দাদজান তাঁকে ওপরে (চেয়ারে) বসতে বললে আব্বজান বলতেন, আমি এখানে বসেই ভালো আছি। তাঁর কখনো উঁচু স্থানে বসার আকাঙ্ক্ষা হয় নি, বরং সাধারণ মানুষের সাথে বসতেন। যেভাবে তিনি ইতোপূর্বে উপদেশ প্রদান করেছেন, আয়োজকরাই আপনাকে সঠিক জায়গায় বসিয়ে দেবে। তিনি নিজে সারা জীবন এর ওপর আমল করেছেন।

একইভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) অন্য আরেকটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, আমাকে কাজী আমীর হোসেন সাহেব বলেছেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট জানতে চাইলাম, হুযূর! হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, সকল নবী ছাগল চরিয়েছেন। হুযূর কি কখনো (ছাগল) চরিয়েছেন? তিনি (আ.) বর্ণনা করেন, হ্যাঁ। আমি একবার বাইরে মাঠে যাই। সেখানে এক ব্যক্তি ছাগল চরাচ্ছিল। সে বলে, আমি একটি কাজে যাচ্ছি, আপনি আমার ছাগলগুলোর খেয়াল রাখুন। কিন্তু গেলো তো গেলই। সন্ধ্যায় ফিরে এল, আর তার ফিরে আসা পর্যন্ত আমাকে তার ছাগল চরাতে হয়েছে; পুরো দিন আমি তার

ছাগল চরাতে থাকি। অথচ তিনি সেই অঞ্চলের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও জমিদারের সন্তান ছিলেন, কিন্তু তিনি এটিকে অসম্মানজনক মনে করেন নি এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই ব্যক্তির ছাগল চরাতে থাকেন, যে তাঁদের বর্গাচাষী বা কাজের লোক ছিল।

একইভাবে তাঁর (আ.) বিনম্রতার উল্লেখ করে আল-ফযল দপ্তরের কর্মী হযরত খাজা আব্দুর রহমান সাহেব বর্ণনা করেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দারোয়ান ছিলাম। আমি নিরাপত্তার খাতিরে, আগন্তুকদের সংবাদ পৌঁছে দিতে বা অবগত করতে অথবা তাঁর (আ.) জরুরি কোনো কাজ করার জন্য তাঁর (আ.) দরজার বাইরে বসে থাকতাম এবং হুযূরের ঘরের ভেতরেও দীর্ঘ সময় ছিলাম, ভেতরেও যাতায়াত ছিল। কিন্তু আমি কখনো হযরত সাহেবকে 'জি' বলা ছাড়া অন্য কোনো শব্দ বলতে শুনি নি। হযরত সাহেব যখনই আমার সাথে কথা বলতেন, সর্বদা 'জি' বলে সম্বোধন করে কথা বলতেন। যখনই কথাবার্তা বলতেন তখন জি শব্দের ব্যবহার অবশ্যই করতেন। আমি তাঁর মাঝে কখনো অহংকার ও দম্ভ দেখি নি। *তিনি বলেন, আমি তাঁর মাঝে কখনো অহংকার ও দম্ভ দেখি নি।* সর্বদা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কথা বলতেন। তাঁর চেহারায় সর্বদা এক ধরনের প্রফুল্লতা বিরাজ করত। তাকে কখনো ভ্রূ কুঁচকাতে বা কপালে ভাঁজ ফেলতে দেখি নি। কখনো তাঁর কপালে (বিরক্তির) ভাঁজ দেখি নি। আমি কখনো হযরত সাহেবকে কাউকে 'ওই' বা 'তুই' বলে সম্বোধন করতে শুনি নি। তিনি কখনো 'ওই' বা 'তুই' শব্দ ব্যবহার করতেন না। সর্বদা অত্যন্ত সম্মানের আচরণ করতেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন, ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কখনো ঘরের কাজ করতে লজ্জাবোধ করতেন না। তিনি নিজের চারপাই (ছোটো চৌকি) নিজেই লাগিয়ে নিতেন, মেঝে ঠিক করতেন অর্থাৎ মোছা বা ঝাড়ু দেবার কাজও নিজেই করে নিতেন; বিছানা নিজেই তৈরি করতেন এবং ঝাড়ু দিতেন। কখনো হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেলে, ছোটো বাচ্চারা তো চৌকিতে ঘুমিয়ে থাকত, হযরত সাহেব নিজে একপাশ থেকে তাদের চৌকি ধরতেন এবং অন্যপাশ থেকে অন্য কোনো ব্যক্তি ধরত এবং ভেতরে বারান্দায় নিয়ে আসতেন। *বর্তমানে তো এসি এবং ফ্যান ইত্যাদি রয়েছে। কিন্তু সেই যুগে তো এগুলো ছিল না। তাই গরমের দিনে মানুষ বাইরে উঠানে ঘুমাতো। আর রাতে ঝড় বা বৃষ্টি আসলে চৌকি উঠিয়ে ভেতরে বারান্দায় নিয়ে আসতে হতো।* তিনি (আ.) শিশুদের চৌকি ওঠাতে সাহায্য করতেন। এমন পরিস্থিতিতে বা সকালের দিকে কেউ যদি শিশুদেরকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগাতে চাইত তবে হুযূর নিষেধ করতেন এবং বলতেন, এভাবে হঠাৎ ঝাঁকুনি দিলে বা চিৎকার করলে বাচ্চারা ভয় পেয়ে যায়। মৃদু স্বরে ডেকে ওঠাবে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব নিজেই অন্য একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন যে, মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; তিনিও আবার এই বর্ণনাটি শুনেছেন মৌলভী রহিম বখশ সাহেবের কাছে; তাঁর পিতা ঘরের বাইরের অংশে চৌবারায় (ওপরের কক্ষে) অবস্থান করতেন। সেখানেই তাঁর জন্য খাবার যেত। যে খাবারই আসত, তা তিনি খেয়ে নিতেন। *মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিষয়ে বলছেন,* আব্বাজান বাইরের চৌবারায় থাকতেন; বাইরে যে একটি কামরা ছিল, সেটিতে অর্থাৎ দোতলায় তিনি থাকতেন। আর সেখানেই তাঁর জন্য খাবার যেত। *হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে যুগে রোযা রেখেছেন তখনও খাবার যেত যা তিনি দরিদ্রদের মাঝে*

বিলিয়ে দিতেন। যাহোক তিনি বলেন, খাবার সেখানে যেত এবং যে ধরনের খাবারই যেত, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেটি খেয়ে নিতেন, কখনো কিছু বলতেন না।

তাঁর (আ.) দাবির পূর্বের একটি ঘটনা জামা'তের ইতিহাসে খুবই বিখ্যাত। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব সবে মৌলভী ও আলেম হয়ে দিল্লি থেকে বাটালা ফেরত আসলে এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সে যুগে বিভিন্ন বিষয়ে ধর্মীয় বিতর্ক করার প্রচলন ছিল মুকাল্লিদিন ও গায়ের মুকাল্লিদিনদের মাঝে। মুকাল্লিদিন তারা, যারা কোনো না কোনো ফিকাহর ইমামের অনুসারী; যেমন- হানাফী, মালেকী প্রভৃতি। আর যারা কোনো ফিকাহর আলেমের অনুসারী নন তাদেরকে গায়ের মুকাল্লিদিন বলা হয়; যেমন- আহলে হাদীস প্রভৃতি। বাটালার অধিবাসীরা যখন এই আলোড়ন হট্টগোল দেখল তখন তাদের দৃষ্টি প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য হযরত আকদাস (আ.)-এর ওপর পড়ল। তাদের নিশ্চিত ধারণা ছিল, একমাত্র তিনিই (আ.) এই যুবক মৌলভীর মুখ বন্ধ করতে পারবেন। অনেক কষ্টে তাঁকে (আ.) এই বিতর্কে রাজি করানো হয়। তিনি (আ.) প্রথমে রাজি ছিলেন না। যাহোক, লোকজনের পীড়াপীড়িতে তিনি সম্মত হন। তাঁকে (আ.) বিতর্কের জন্য নিয়ে আসা হয়। উভয়পক্ষের সমর্থকদের একটি বড়ো অংশ একত্রিত ছিল। *উভয়পক্ষের সমর্থকরা একত্রিত হয়।* সেদিন বিশেষভাবে মুকাল্লিদিন দলটি নিজেদের বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল আর তাদের আশা যথার্থ ছিল। কেননা, আজকে এই বিশিষ্ট আলেমকে বিতর্কের জন্য আনা হয়েছে। মুকাল্লিদিনদের ধারণা ছিল, আজকে আমরা অবশ্যই বিজয়ী হবো কেননা আজ হযরত মসীহ্ মওউদ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এসেছেন। এর কারণ হলো, তাঁর পাকড়াও এত দৃঢ় হতো যে, প্রতিপক্ষ জালে আবদ্ধ চড়ুইয়ের মতো নিরুপায় হয়ে যেত। যাহোক, তিনি (আ.) যখন বিতর্কস্থলে পৌঁছালেন তখন মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি, মতবাদ ও বিশ্বাস কী– সেগুলো উপস্থাপন করুন যেন খণ্ডন করা যায়। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব বললেন, আমার মতে পবিত্র কুরআনের স্থান সর্বাগ্রে, এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ও হাদীস, যে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। হযরত আকদাস (আ.) মৌলভী সাহেবের কাছ থেকে তার বিশ্বাস সম্পর্কে শুনে বলেন, আমার মতে আপনার মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন কোনো আপত্তিকর বিষয় নেই যেটি খণ্ডন করা যেতে পারে। যারা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল তাদের ধারণা ছিল, এটিতো আমাদের পরাজয় গণ্য হবে আর প্রতিপক্ষ নিজেদের বিজয়ের ডঙ্কা বাজাবে। *তিনি সোজাসাপ্টা মৌলভী সাহেবকে বলে দিয়েছেন, আমি তো কোনো আপত্তিকর বিষয় দেখি না।* তাই যা-ই হোক না কেন, মৌলভী সাহেবকে এই বিতর্কে কিছুটা লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন করতে হবে। *তাদের কিছুটা হলেও পরাজয়ের গ্লানি সওয়া উচিত।* কিন্তু হযরত আকদাস (আ.) জয়-পরাজয়ের গর্ব ও লাঞ্ছনার ঊর্ধ্বে থেকে পরম বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করে সেখান থেকে ফিরে আসেন।

হযরত আকদাস (আ.) এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, ১৮৬৮ অথবা ১৮৬৯ সালেও উর্দূতে একটি বিস্ময়কর ইলহাম হয়েছিল যেটি এখানে লেখা সমীচীন হবে। এই ইলহামের উপলক্ষ্য ছিল, মৌলভী আবু সাঈদ মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী যিনি কোনো এক যুগে এই অধমের সহপাঠীও ছিল, যখন নতুন নতুন মৌলভী পাশ করে বাটালা আসেন, আর বাটালার অধিবাসীদের কাছে তার চিন্তাধারা ও মতাদর্শ অপছন্দনীয় ঠেকে, তখন একজন ব্যক্তি উল্লিখিত মৌলভী সাহেবের সাথে কোনো বিতর্কিত বিষয়ে মুবাহাসার জন্য এই অধমকে বাধ্য করে। তার কথায় এই অধম সন্ধ্যাবেলা সেই ব্যক্তির সাথে উল্লেখিত মৌলভী সাহেবের

বাড়িতে যায় এবং মৌলভী সাহেবকে তার পিতাসহ মসজিদে পায়। তারপর সংক্ষেপে, এই অধম মৌলভী সাহেবের সেই সময়ের বক্তৃতা শুনে বুঝতে পারে যে, তার বক্তৃতায় এমন কোনো বাড়াবাড়ি নেই যা আপত্তিজনক হতে পারে। তাই শুধু আল্লাহ্‌র খাতিরে বিতর্ক পরিত্যাগ করে। রাতে খোদা তা'লা তাঁর ইলহাম ও কথোপকথনে এই বিতর্ক পরিত্যাগের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, তোমার খোদা তোমার এই কাজে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তিনি তোমাকে অশেষ বরকত দান করবেন, এমনকি বাদশাগণও তোমার পোশাকে বরকত অন্বেষণ করবে। এরপর কাশফে সেই বাদশাদের দেখানো হয় যারা ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন। যেহেতু কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের খাতিরে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা হয়েছিল, তাই অনুগ্রহের সেই মূর্ত প্রতীক আল্লাহ্ চান নি যে, বিষয়টিকে বিনা পুরস্কারে ছেড়ে দেবেন।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব এই ঘটনাটি তাঁর পুস্তক 'হায়াতে আহমদ'-এ বর্ণনা করেছেন এবং এর ওপর একটি টীকাও লিখেছেন। তিনি লেখেন, লোকেরা বিতর্কের সাধারণ রীতি ও বিতর্ককারীদের অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে জানে। নিজের প্রতিপক্ষ বা বিপক্ষের কথা যদি সঠিক হয়– তা মেনে নেওয়া এবং জনসমক্ষে স্বীকার করা খুবই কঠিন। আমি আলেমদের অবমাননা করছি না; কিন্তু আলেমদের জন্য প্রাণ দেওয়া সহজ, তবে নিজের ভুল তো দূরের কথা, প্রতিপক্ষের সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত কথা মেনে নেবার অভ্যাসটুকুও হারিয়ে গেছে। *আজও একই অবস্থা।* কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অবস্থা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ঠা ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির রঙে রঙিন ছিল। আর এটিও জানা বিষয়, তিনি স্বভাবতই পছন্দ করতেন না যে, মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্কলহ থাকবে এবং তারা মতবিরোধের কারণে সত্যের সন্ধান ও সত্যবাদিতা ছেড়ে দেবে। আর এটি কতটা সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রমাণ যে, যার সাথে বিতর্ক করতে যাচ্ছেন, তার বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছেন, তার জ্ঞান ও প্রভাবের কারণে মনে কোনো বাধা বা দ্বিধা নেই। কিন্তু তার মুখ থেকে একটি সত্য কথা শুনে এ কথার মোটেও পরোয়া করছেন না যে, লোকেরা কী বলবে! তারা একে পলায়ন বলবে নাকি প্রতিপক্ষের কাছে ভীত হওয়া বলে অভিহিত করবে। যে কথা সত্য ছিল, তা মেনে নিলেন। *যা সত্য ছিল তা স্বীকার করে নিলেন।* তিনি কোনো পরোয়া করেন নি যে, লোকেরা কী বলে; আর তার সঠিক হওয়াকে নিজের স্বীকৃতি দ্বারা সত্যায়িত করলেন। এটি এমন একটি কাজ যার উদাহরণ নবীদের এবং তাঁদের বিশেষ অনুসারীদের বাইরে আর কোথাও পাওয়া যায় না। ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রবৃত্তি ও কামনাকে চূর্ণ করার শক্তিশালী প্রেরণা কেবল মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই লাভ হতে পারে। অতঃপর এই কাজের গ্রহণযোগ্যতার নিদর্শন তখনই প্রকাশিত হলো এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ইলহামের মাধ্যমে সুসংবাদ দিলেন এবং যেন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট– এর সনদ দান করলেন। মানুষ চায় পৃথিবীতে তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাক এবং লোকেরা তার প্রতি মনোযোগী হোক। আল্লাহ্ তা'লা এই কাজের ফলস্বরূপ জানালেন, বাদশাগণও তোমার পোশাকে বরকত অন্বেষণ করবে। এটি সেই যুগের কথা যখন কিনা 'বারাহীনে আহমদীয়া' রচনার চিন্তাও করা হয় নি, (মাহদী হবার) দাবি তো দূরের কথা। তিনি যেন জগতের প্রতি সম্পর্কহীনতার মাঝে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। চাকরিও ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবন-জীবিকার চিন্তা যদিও তাঁর মনমস্তিষ্কে প্রভাব ফেলতে পারে নি, তবে পরিবারের লোকেরা অবশ্যই ভাবত যে, তিনি কী করবেন। *তখন ইলহাম হয়, বাদশাগণ বরকত অন্বেষণ করবে, যখন কিনা তাঁর কাছে কিছুই ছিল না। তাঁর পিতা মহোদয় তখন জীবিত ছিলেন।* মোদ্দাকথা,

জীবনের সেই স্তরে ছিলেন যেখানে একজন বস্তুবাদী মানুষ বড়ো বড়ো আশায় বুক বাঁধে এবং বয়সের সেই অংশ যখন সব ধরনের চিন্তাভাবনা ও আত্মসম্মানবোধ ও আত্মপ্রদর্শনের আবেগ থাকে প্রবল। নিজের অভিমত প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারে জেদ ও হঠকারিতা কাজ করে। এহেন পরিস্থিতিতে হযরত মির্যা সাহেব একজন বিখ্যাত মৌলভীর সাথে ধর্মীয় বিতর্কের জন্য যান এবং তার বক্তব্য শোনার পর সেগুলোকে সঠিক দেখে তার সত্যায়ন করেন। লোকেরা কী বলবে– সে বিষয় নিয়ে তিনি আদৌ চিন্তা করেন নি, কিংবা এ বিষয়ে তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন নি যে, এই ব্যক্তি কিছু বিশ্বাসের কারণে ব্যাপক বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছেন আর আমি আমার কথার মাধ্যমে তাকে সমর্থন করছি; আমার বিরুদ্ধেও বিরোধিতার ঝড় উঠতে পারে। সুতরাং ভেবে দেখুন, এই পরিস্থিতিতে যখন হানাফী ও গায়ের মুকাল্লিদদের মাঝে এক ভয়াবহ লড়াই চলছিল, আর এমন সময় একজন আহলে হাদীসকে সমর্থন করার অর্থ হচ্ছে অগণিত বিপদকে আমন্ত্রণ জানানো, (তখন) হযরত মির্যা সাহেব মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন সাহেবকে সমর্থন করেন; অথচ তাঁকে ডাকা হয়েছিল তার সাথে ধর্মীয় বিতর্কের জন্য।

এটা ভাবা বা একথা মনে করা চরম বোকামি হবে যে, মৌলভী আবু সাঈদ সাহেবের জ্ঞানের জোর তাঁকে অর্থাৎ মির্যা সাহেবকে এখানে চুপ করিয়ে দেবার কারণ ছিল। যদি পরবর্তী যুগে তিনি (আ.) মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর সাথে বক্তৃতা ও লিখিত বিতর্ক না করতেন এবং এই ভয়ংকর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুহাম্মদ (সা.)-এর এই সাহসী বীর না আসতেন, তাহলে এই কল্পনা কিছুটা হলেও যৌক্তিক হতো। *এ ধারণা কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, মির্যা সাহেব সেই সময়ে কোনোভাবে ভীত ছিলেন। কারণ পরবর্তীকালের ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি কয়েকবার মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং তাকে ডেকে বলেছেন, তিনি কী ভুল করছেন এবং কী সঠিক করছেন।* তিনি আরো লিখেছেন, কোনো অবস্থাতেই এক সেকেন্ডের জন্যও তার জ্ঞান ও তার ভয় প্রভাব বিস্তার করা সম্ভবপর ছিল না।

এগুলোই সেসব ঘটনা যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে, এহেন চিন্তা অজ্ঞতা বৈকি। বরং এর মূলে একটি শুধু একটি বিষয়ই কার্যকর ছিল, আর তা হলো ধর্মের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা। *ধর্মের ব্যাপারে নিষ্ঠা ছিল, তাই সেই সময়ে তিনি তা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর ভয়ে তা করেন নি, কারণ পরবর্তীকালে তিনি তাকে বহুবার চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং তাকে (বিতর্কে) আমন্ত্রণও জানিয়েছেন এবং তাকে সঠিক পথে আসার পরামর্শও দিয়েছিলেন।*

মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীকে লেখা একটি পত্রে মির্যা সাহেব তাকে সত্যের বার্তা পৌঁছিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে উচ্চ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের সম্পর্কে পরম বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ করেছেন। তিনি লেখেন:

আমার সেবাধন্য আমার শ্রদ্ধেয় ভাই মৌলভী সাহেব, সাল্লামাহু তা'লা। আপনার পত্র পেয়েছি। *এতে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'ও লেখা ছিল।* এই অধমের জন্য সমস্যার কথা হলো, স্বাস্থ্য প্রায়ই হঠাৎ করে এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে, মৃত্যু আসন্ন মনে হয় এবং কিছু অসুস্থতা দিনরাত লেগে থাকে। বেশি কথা বললে অসুস্থতার প্রকোপ শুরু হয়। বেশি চিন্তা করলেও একই অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দেয়। আপনার শেষ পত্রটি এসেছে, মনে হয় পত্রটি মৌলভী আব্দুল জব্বার সাহেবসহ লিখেছেন, *অর্থাৎ আপনারা দুইজন মিলে পত্রটি লিখেছেন।* তাই উত্তর এভাবে লেখা হচ্ছে যে, এই অধম বর্তমানে

রোগের আধিক্যের কারণে পুরোপুরি অকেজো হয়ে পড়ছে। মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে বিতর্ক করার শক্তি এখন আমার নেই। *এই মুহূর্তে আলোচনায় অংশ নেবার শক্তি আমার নেই।* একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই এই তিনটি গ্রন্থ– *অর্থাৎ তিনি (আ.) যে পুস্তক তিনটি রচনা করেছিলেন– ফতেহ ইসলাম, তৌযিহে মারাম এবং ইযালায়ে আওহাম;* এগুলো এমনভাবে লেখা হয়েছে যে, অধিকাংশ সময় অন্য কেউ আমার কথা লিপিবদ্ধ করে নিত আর নিজের হাতে কিছু লেখা আমার পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। বইয়ের বাক্যগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংশোধন করার মতো সময়ও আমার নেই। *মৌলভী সাহেবকে তিনি লেখেন, হাদীসের বিষয়ে আপনার জ্ঞান অত্যন্ত ব্যাপক। আমি তো কেবল এই তিনটি বই লিখেছি, অথচ হাদীস বিষয়ে আপনার জ্ঞান অত্যন্ত সুপরিসর, আপনি একজন বড়ো আলেম;* আর এ অধম একজন নিরক্ষর ও অজ্ঞ মানুষ মাত্র। *হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে নিজেকে নিরক্ষর ও অজ্ঞ বলেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটি বলে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করছেন যে,* না কোনো ইবাদত আছে, না আছে আধ্যাত্মিক সাধনা, না কোনো জ্ঞান আছে, না আছে যোগ্যতা। মোটকথা, কোনোকিছুই আমার নেই। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ ছিল, যা ছিল অকাট্য ও সুনিশ্চিত। এই অধম তা পৌঁছে দিয়েছে মাত্র; এখন তা মেনে নেওয়া বা না মানা প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যাপার ও বিবেচনাবোধের ওপর নির্ভরশীল। *তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাকে তবলীগও করেছিলেন।*

হযরত মুন্সি আহমদ জান সাহেবের নামে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি প্রকাশিত চিঠি রয়েছে, তাতেও তাঁর বিনয় ও নম্রতার উল্লেখ রয়েছে। তিনি (আ.) লেখেন, আপনার পত্রটি হস্তগত হলো। মহান আল্লাহ্‌র করুণা ও অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই, যিনি এ অধম বান্দার জন্য এমন আন্তরিক সুহৃদ জুটিয়ে দিয়েছেন, যাঁদের অস্তিত্ব এই নগণ্য ব্যক্তির জন্য সম্মান ও গৌরবের কারণ। পরম দয়ালু আল্লাহ্ আপনাকে সুখে ও শান্তিতে রাখুন এবং আপনার আন্তরিক সদিচ্ছার উত্তম প্রতিদান দিন। এ অধম নিতান্ত অকর্মণ্য ও তুচ্ছ; আর এটি সম্পূর্ণভাবে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র পরম কৃপা ও অনুগ্রহ যে, তিনি এই অযোগ্য বান্দার ওপর কোনো প্রকার যোগ্যতা ছাড়াই অফুরন্ত রহমতের বারিধারা বর্ষণ করে চলেছেন, রহমতের অজস্র বৃষ্টি বর্ষণ করছেন। তিনি ত্রুটির পর ত্রুটি দেখতে পান, তবুও অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করে যান; অন্যায়ের পর অন্যায় দেখেন, তবুও পুরস্কারের পর পুরস্কার দিয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও কৃপালু। এমন ভাষা আমি কোথায় পাই যা দিয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি! এ অধম অতি নগণ্য, তুচ্ছ, সম্বলহীন এবং পুরোপুরি নিঃস্ব। তিনি আমাকে ধূলায় পেয়ে ওপরে তুলে নিয়েছেন; *অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ভূপাতিত অবস্থায় পেয়ে উঠিয়ে নিয়েছেন* এবং আমাকে নিতান্তই অযোগ্য দেখে আমার দোষত্রুটি গোপন রেখেছেন। আমার দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তিনি নিজে আমাকে শক্তি দান করেছেন এবং আমার অজ্ঞতা দেখে আমাকে স্বীয় জ্ঞান দান করেছেন। *সমস্ত জ্ঞান আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত; অর্থাৎ আমার কাছে যে জ্ঞান রয়েছে, তা সবই আল্লাহ্‌রই দান করা।* আমার প্রতি তিনি এমন সব অনুগ্রহ করেছেন যা আমি গণনা করে শেষ করতে পারব না। আর তাঁর অনুগ্রহের অন্যতম একটি বিকাশ হলো, তিনি আপনার মতো পুণ্যবান ভাইদের অন্তরে এ অধমের প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন। সুতরাং তাঁর অনুগ্রহরাজির সাথেই এটি সম্পর্কিত যে, তিনি এই সবকিছুকে আরও সমৃদ্ধি দান করবেন এবং সেসব মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন, যারা এই সিলসিলায় সম্পৃক্ত হয়েছেন। *অর্থাৎ যারা এখন আমার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের উন্নতি দান করবেন।*

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব এই চিঠিটি প্রকাশ করার সময় তার একটি নোটে লিখছেন, এই চিঠি থেকে স্পষ্ট যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে আল্লাহ্‌র সীমাহীন ভালোবাসা ও মাহাত্ম্য বিদ্যমান ছিল এবং তাঁর বিনয়, দীনতা ও নম্রতার পরম পরাকাষ্ঠাও এতে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এসব অনুগ্রহ ও পুরস্কারের প্রতি এক গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধ্বনিত হচ্ছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন মসীলে মসীহ্ হবার দাবি করেন তখন মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন। অত্যন্ত অহংকারের সাথে এবং চরম অশোভন শব্দ ও সম্বোধনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে চিঠি লিখতে শুরু করেন। এমনকি নিজের 'ইশায়াতুস সুন্নাহ' নামক পত্রিকায়ও তিনি সৌজন্যবহির্ভূত ভাষা প্রয়োগ করতে থাকেন এবং ঘোষণা করেন, এটি একটি ফিতনা এবং আমি এই জামা'তকে তছনছ করে দেবো। তিনি একথাও লেখেন যে, আমি যেভাবে তাকে আকাশে উঠিয়েছিলাম, ঠিক সেভাবেই এখন মাটিতে নামাবো। অর্থাৎ (নাউযুবিল্লাহ্) মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বলতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি প্রশংসার মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আকাশে উঠিয়েছিলেন এবং এখন তিনিই তাকে নীচে নামিয়ে ছাড়বেন। মৌলভী সাহেবের অহংকার ছিল যে, 'বারাহীনে আহমদীয়া'র বিষয়ে তার লিখিত রিভিউ মূলত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এক উচ্চাসনে সমাসীন করেছিল; কিন্তু এসব কটুকথা, অহংকারসূচক বাক্যালাপ এবং চিঠিপত্রের জবাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এমন ধৈর্য, সহনশীলতা ও বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করেছিলেন, যা মসীহ্ নাসেরীর [তথা হযরত ঈসা (আ.)-এর] ধৈর্যকেও হার মানায়।

এখানে মৌলভী সাহেবের নামে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কেবল একটি চিঠি উপস্থাপন করা হলো, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তার কটু ভাষা ও অহংকারের বিপরীতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অন্তরে সহানুভূতি, হিতাকাঙ্ক্ষা ও বিনয়-নম্রতার এক মহাসমুদ্র তরঙ্গায়িত ছিল। বস্তুত তিনি (আ.) মৌলভী সাহেবকে সম্বোধন করে লেখেন,

"আপনার চিঠি পেয়েছি। যদিও আল্লাহ্ তা'লা ভালো করেই জানেন, এই অধম তাঁরই পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং এমন সব বিষয়ে– যেখানে সাধারণ মানুষের মাঝে নৈরাজ্যের আশঙ্কা থাকে– যতক্ষণ না কাজটি সম্পূর্ণ অকাট্য ও সুনিশ্চিতভাবে এ অধমের ওপর প্রকাশ করা হয়, ততক্ষণ আমি তা কখনোই মুখে আনি না। তবে এতে মহান আল্লাহ্‌র কোনো হিকমত বা প্রজ্ঞা নিশ্চয় থাকবে। মসীহ্‌র অবতরণের বিষয়ে– যার সাথে ইসলামের মূল বা সারবস্তুর সাথে সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই এবং একজন মুসলমানের ওপর এর প্রকৃত তাৎপর্য উন্মোচন করা হয়েছে, যার প্রতি ভাই হিসেবে সুধারণা পোষণ করা উচিত ছিল– কিন্তু সেই বিষয়ে আপনাকে একটি বিরোধিতামূলক লেখার জন্য এটি প্ররোচিত করেছে। *প্রথম কথা হলো, আমি যদি বলি– ঈসা ইন্তেকাল করেছেন, তবে একজন মুসলমান হিসেবে আপনাদের তো আমার সমর্থন করা উচিত ছিল; কিন্তু আপনারা বিরোধিতামূলক কথাবার্তা শুরু করে দিলেন। তিনি (আ.) বলেন,* আমি জানি, এতে আপনার নিয়্যত বা উদ্দেশ্য ভালোই হবে; *হয়ত ভালো নিয়্যত নিয়েই এমনটা করেছেন।* আমার হৃদয়ে আপনার এই তাড়াহুড়ার ব্যাপারে অভিযোগ থাকলেও, আর আমি তা আপনার সামনে কিংবা আপনার অনুপস্থিতিতে যদি প্রকাশও করি, তবুও আপনার নিয়্যতের প্রতি আমার সুধারণা রয়েছে। আমি আপনাকে বর্তমান যুগের অধিকাংশ আলেম, বরং আপনি যদি অসন্তুষ্ট না হন, তবে আল্লাহ্‌র খাতিরে ধর্মীয় চেষ্টাপ্রচেষ্টার দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলভী নযীর হোসেনের চেয়েও উত্তম মনে করি। আর যদিও আমি আপনার কাছে এই বিষয়গুলোর অভিযোগ করছি, তবুও আপনার অন্তরের

পরিচ্ছন্নতার কারণে আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা রয়েছে। আমাকে যদি মানুষ শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়, তবে আমি বুঝব– আমার ভাগ্যে এমনটিই লেখা ছিল। জয়-পরাজয়ের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, বরং বন্দেগি ও আনুগত্যই আমার মূল উদ্দেশ্য। *আনুগত্য করাই আমার কাজ; আমি জয়ী হলাম নাকি হলাম না– তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।* আমাকে তো আল্লাহ্ তা'লা আদেশ করেছেন– 'এটি করো', আর তাঁরই আনুগত্যে আমি এটি করছি এবং এই দাবি করেছি। আমি জানি, এই বিরোধিতার পেছনে আপনার নিয়্যত ভালোই হবে; কিন্তু আমার মতে এটি উত্তম হবে যে, আপনি প্রথমে আমার সাথে আলাপ-আলোচনা করে এবং আমার পুস্তকসমূহ– অর্থাৎ ফতেহ ইসলাম, তওযীহে মারাম এবং ইযালায়ে আওহাম এই পুস্তক তিনটি পড়ে নিয়ে তারপর কিছু লিখুন। আপনার মতো বন্ধুর বিরোধিতায় আমার কোনো দুঃখ নেই, কারণ মতের এই বিরোধিতাও হয়ত সত্যের জন্যই হবে। *হয়ত আপনি সত্যের খাতিরেই লড়াই করছেন; কিন্তু প্রথমে আপনি আমার বইগুলো তো পড়ে নিন।* এখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার মতো স্বাস্থ্য আমার রয়েছে, আমি আসতে পারব। *আমার স্বাস্থ্য এখন ঠিক আছে এবং আমি সাক্ষাতের জন্য আসতে পারি।* আপনি যদি বাটালায় চলে আসেন– সেক্ষেত্রে যদিও আমি অসুস্থ এবং আমার মাথা ঘোরার সমস্যা এতটাই তীব্র যে, দাঁড়িয়ে নামায পড়া যায় না– তবুও আমি কোনোমতে কষ্ট করে হলেও আপনার কাছে পৌঁছে যাব। অন্তত ভ্রমণ করার মতো স্বাস্থ্য আমার রয়েছে; তবে আমার মাথাব্যথা ও মাথাঘোরার অসুস্থতা রয়েছে। তা সত্ত্বেও আমি পৌঁছে যাব।"

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেবের নামে অন্য এক পত্রে লেখেন, "আপনি যদি অসন্তুষ্ট না হন তবে এ অধমের জানামতে আমার ভাই মৌলভী হেকিম নূরুদ্দীন সাহেবের বিপরীতে আপনার লেখায় কিছুটা কঠোরতা ছিল। *হেকিম মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব আপনাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার জবাবে আপনি অত্যন্ত কঠোর শব্দ ব্যবহার করেছেন।* আল্লাহ্ তা'লা বিনয় ও নম্রতাকে সর্বদা পছন্দ করেন, আর নিজ ভাইদের সাথে আলেমদের আখলাক বা ব্যবহার সর্বোচ্চ স্তরের হওয়া উচিত। *ব্যবহার-চরিত্র উন্নত হওয়া উচিত।* যে ধর্মের সমর্থন ও সহানুভূতির জন্য দিন-রাত চেষ্টা করা হচ্ছে, তা আসলে কী? তা হলো– আমাদের সমস্ত চালচলন, ওঠাবসা এবং সামগ্রিক কর্মকাণ্ড যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অভিপ্রায়ের সাথে পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আমার মতে, চরিত্রের সমস্ত শাখার মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা বিনয়, নম্রতা ও অধীনতা এবং অহংকারবিরোধী এমন প্রতিটি আত্মনিবেদনকে যেভাবে পছন্দ করেন, চরিত্রের আর কোনো শাখাকে তিনি সেভাবে পছন্দ করেন না। আমার মনে আছে, একবার এক চরম অধার্মিক হিন্দুর সাথে এ অধমের আলোচনা হয়েছিল এবং সে সুদৃঢ় ধর্ম ইসলামের অবমাননা করে চরম হীন শব্দ ব্যবহার করেছিল। ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধের কারণে এ অধম কিছুটা 'ওয়াগ্লুয্ আলাইহিম' অর্থাৎ 'তাদের প্রতি কঠোর হও'– এ বিষয়ের ওপর আমল করেছিলাম। কিন্তু যেহেতু একজন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে সেই কঠোরতা করা হয়েছিল, তাই আমার ওপর ইলহাম হয়– 'তোমার বক্তব্যের মাঝে কঠোরতা রয়েছে। কোমলতা চাই, কোমলতা!' *আমি যদিও তাকে কেবল প্রত্যুত্তরই দিয়েছিলাম, তবুও সে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বলেন, তুমি নম্র ব্যবহার করো।* আমরা যদি নিরপেক্ষভাবে দেখি, তবে আমরা কী আর আমাদের জ্ঞানই বা কী! একটি চড়ুই যদি সমুদ্রে চঞ্চু বা ঠোঁট ডোবায়, তবে তা থেকে কতটুকুই বা কমবে? *সমুদ্রের পানি থেকে একটি চড়ুই যদি পানি পান করে বা ঠোঁট ছোঁয়ায়, তবে তাতে সমুদ্রের কী কমতি হবে?* আমাদের জন্য এটাই শ্রেয়, আমরা বাস্তবে যেমন একেবারেই নগণ্য, তেমনই যেন

ধূলিসম হয়ে থাকি। আমাদের প্রতিপালক-প্রভু যেহেতু আমাদের জন্য অহংকার ও গর্ব করা পছন্দ করেন না, তবে আমরা কেন তা করব? এমন সম্মান– যার ফলে আমরা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির পাত্র হয়ে যাব– তার চেয়ে আমাদের জন্য অসম্মানই শ্রেয়।" *আল্লাহ্ তা'লাকে অসন্তুষ্ট করার চেয়ে আমাদের জন্য অপমানিত হতে থাকা ঢের ভালো।*

সুতরাং তাঁর (আ.) প্রতিটি কথা ও কাজ বিনয় প্রকাশের পরাকাষ্ঠা ছিল। কেবল একটিই অন্বেষণ ছিল– তা হলো, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি যেন লাভ করা যায়, তাঁর বাণী পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং তাঁর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তিনি (আ.) আমাদেরও বার বার এ নসীহতই করেছেন যে, বিনয় অবলম্বন করো, এর মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত; আর এটিই তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য পাইয়ে দেবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিনয়ের পথসমূহ অবলম্বন করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)